

বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.) গত ১৬ই অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমু'আর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সরলতা ও সাদাসিধে জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও ঘটনাবলী বর্ণনা করেন।

তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযুর (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা সোয়াদ এর ৮৭ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন, **قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ** অর্থাৎ, “তুমি বলো, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না আর আমি কৃত্রিমতা অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্তও নই।” এরপর বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা.)-কে এ ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যে বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন তা কেবল মানুষের কল্যাণ এবং উভয়জগতের জীবনকে সুন্দর করার জন্য; এর বিনিময়ে তিনি কোনো পুরস্কার বা প্রতিদান চান না। এর প্রতিদান কেবল তাঁর কাছ থেকেই আসবে, যিনি মহাবিশ্বের সকল ধন-সম্পদের মালিক আর পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। আল্লাহ তা'লা নিজেই তাঁর সমস্ত মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করছিলেন, তাই এর চেয়ে বেশি কিছু তাঁর আর প্রয়োজন ছিল না।

মহানবী (সা.)-এর জীবন এমন সাদাসিধে ছিল যা তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় ফুটে উঠেছে। একবার তিনি (সা.) বলেন, ‘আদম সন্তানের জন্য কেবল একটি ঘর, নগ্নতা ঢাকার মতো প্রয়োজনীয় পোশাক, শুকনো রুটি এবং পানি ছাড়া আর কিছুর অধিকার বা প্রয়োজন নেই।’ বাস্তবে তিনি (সা.) নিজের জীবনযাপনের পদ্ধতিই এখানে বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সা.) আমাদেরকে দরিদ্রদের ভালোবাসার নির্দেশ দিয়েছেন এবং দোয়া করেছেন, **اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِينًا وَأَمُتْنِي مَسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ** ‘হে আল্লাহ, আমাকে মিসকীন ও বিনম্র অবস্থায় জীবিত রাখো, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং মিসকীনদের সঙ্গেই আমাকে পুনরুত্থিত করো।’ একইভাবে মুমিনদের সাদাসিধে জীবনযাপনের তাগিদ দিয়ে মহানবী (সা.) বলেন, ‘অনাড়ম্বর জীবনযাপন ঈমানের অঙ্গ।’ একবার কয়েকজন দরিদ্র মুহাজির মহানবী (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করেন যে, ‘আল্লাহ তা'লা ধনীদেবকে তাদের চেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, একজন দরিদ্র ঈমানদার একজন ধনী ব্যক্তির চেয়ে ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ কাজেই, তারা কতই না সৌভাগ্যবান যারা সাদাসিধে ও অল্পেতুষ্ট জীবনযাপন করে।

অথচ আজকের বিশ্ব মানুষকে লোভের দিকে এমনভাবে উৎসাহিত করছে যে, মানুষের হৃদয় কেবল পার্থিব চিন্তায়ই মগ্ন থাকে। যারা মহানবী (সা.)-এর উপদেশ মেনে চলবে, তারা অবশ্যই আল্লাহর পুরস্কার লাভ করবে। তবে এর অর্থ এটিও নয় যে, মানুষ অলস হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। বরং এর অর্থ হলো, মানুষ তার সাধ্যমতো চেষ্টা ও পরিশ্রম করবে; তারপর সাদাসিধে জীবনযাপন করবে, স্বল্পেতুষ্ট থাকবে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে— এটি একজন মুমিনের সুমিষ্ট ফল যা তার ঈমানে সমৃদ্ধি দান করে। পরিশ্রম এবং নিজের সামর্থ্যের পরিপূর্ণ ব্যবহার একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, এটিও ঈমানের অঙ্গ। একবার মহানবী (সা.) বলেন, মানুষের উচিত এই পৃথিবীতে একজন পথিকের মতো বসবাস করা। সকাল

হলে রাতের অপেক্ষা কোনো না আর রাত হলে সকালের অপেক্ষা কোনো না। সুস্থতার সময় অসুস্থতার দিনের জন্য প্রস্তুতি নাও আর জীবদশায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নাও। অন্য কথায়, প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের কথা স্মরণে থাকা উচিত।

মহানবী (সা.) তাঁর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে নিষেধ করতেন যেমনটি খ্রিস্টানরা মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঈশ্বর বানিয়ে বসেছিল। মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীগণ (রা.)-কে কেবল একথা বলার পরামর্শ দিতেন যে, তিনি আল্লাহর একজন বান্দা ও তাঁর রসূল (সা.)। মুতাররিফ বর্ণনা করেন, আমার পিতা [হযরত আবদুল্লাহ বিন আশ-শিখখীর (রা.)] বলেছেন, একবার তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলে, আপনি আমাদের নেতা। মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, প্রকৃত নেতা হলেন আল্লাহ। তখন তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাদের মধ্যে দয়া ও অনুগ্রহে সবচেয়ে মহান। মহানবী (সা.) তাকে এ ধরনের বাড়তি কথাও বন্ধ করতে বলেন, পাছে শয়তান তাকে প্ররোচিত করে।

মহানবী (সা.) কেবল সাদাসিধে জীবন যাপন করাই শেখাননি, বরং শিরক বা আল্লাহর সাথে অংশীবাদিতার সূক্ষ্মতম দিক থেকে মুক্ত থাকার শিক্ষাও দিয়েছেন। একবার একদল বালিকা দফ (এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র) বাজিয়ে বদরের শহীদদের প্রশংসায় গান গাচ্ছিল এবং পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর প্রশংসাও করছিল। গাইতে গাইতে তারা বলে উঠে, তাদের মাঝে এমন একজন নবী আছেন যিনি আগামীকাল কী ঘটবে তাও জানেন। মহানবী (সা.) তাদের তখন থামিয়ে দেন, কারণ তাদের প্রশংসা সীমাতিক্রম করে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্বের দিকে যাচ্ছিল। মহানবী (সা.) তাদের এ ধরনের প্রশংসা বন্ধ করতে বলেন এবং বদরের শহীদদের মূল আলোচনায় ফিরে যেতে নির্দেশ দেন।

অতঃপর হযূর (আই.) বলেন, মদীনায হিজরতের পরে মসজিদে নববীর পাশে মহানবী (সা.)-এর একটি ছোট্ট ঘর ছিল। মহানবী (সা.) যখন একাধিক বিয়ে করেন তখন সেই ঘরের পাশে একইভাবে আরও কিছু কক্ষ তৈরি করা হয়। শহরের অন্যান্য ঘরগুলো পাথরের তৈরি হলেও, মহানবী (সা.)-এর ঘরগুলো মাটি ও খেজুরের পাতায় তৈরি ছিল। কোনো কোনো বিবরণ অনুযায়ী, এই কক্ষগুলো দৈর্ঘ্যে পাঁচ মিটার এবং প্রস্থে চার মিটার ছিল এবং ছাদ এতটা নিচু ছিল যে, হাত তুললেই তা ছোঁয়া যেত। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর কোনো বিলাসবহুল বা আরামদায়ক বিছানা ছিল না; তিনি মেঝের ওপর একটি চাটাই বিছিয়ে ঘুমাতে। তাঁর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, বাড়িতে প্রায়ই খাওয়ার বা পানের জন্য কেবল খেজুর আর পানি ছাড়া কিছুই থাকত না। এমনকি মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর দিনেও ঘরে একমাত্র খাবার ও পানীয় ছিল খেজুর এবং পানি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, ‘ভেবে দেখুন! শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মহানবী (সা.) কীভাবে অগণিত বিপদ এবং বহু শত্রু, সমালোচক ও বিরোধির হুমকি সত্ত্বেও দৃঢ় ও অবিচলভাবে তাঁর নবুয়্যতের দাবির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বছরের পর বছর তিনি যে নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করেছেন, তা সাফল্যের সমস্ত সম্ভাবনাকে অকল্পনীয় করে তুলেছিল এবং দিনে দিনে তা বেড়েই চলছিল। এসব কষ্টের মুখোমুখি হয়েও তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে যে, পার্থিবতা অর্জনের কোনো পরিকল্পনাই তাঁর ছিল না।’

তিনি (আ.) বলেন, ‘অবশেষে যখন ইসলাম বিজয়ী হয় এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির যুগ আসে, তখনও তিনি কোনো ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেননি, কোনো দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ তৈরি করেননি, বিলাসবহুল বা রাজকীয় জীবনযাপনের জন্য কোনো রসদ জমা করেন নি এবং কোনো ব্যক্তিগত সম্পদ জড়ো করেন নি। বরং তিনি এতীম, দুস্থ, বিধবা ও ঋণগ্রস্তদের মাঝে সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছেন, অথচ তিনি নিজে কখনো পেট পুরে একবেলা খাবারও খাননি।’

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরি আর এর ভেতরে খেজুর গাছের ছাল বা পাতা ভরা থাকত। হযরত হাফসা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যে চাদরের ওপরে ঘুমাতে তিনি তা দুই ভাঁজ করে দিতেন। এক রাতে তিনি ভাবেন মহানবী (সা.)-এর আরামের জন্য এটি চার ভাঁজ করে দেওয়া উচিত। পরদিন সকালে মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, বিছানা পরিবর্তন করা হয়েছে কি-না? তিনি উত্তরে বলেন, বিছানা একই ছিল, তবে তিনি চাদরটি চার ভাঁজ করে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে আগের মতোই বিছানা পেতে দিতে বলেন, পাছে অতিরিক্ত আরামের কারণে তাহাজ্জুদ বা নামাযের জন্য ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। একবার হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে তাঁর সাথে দেখা করতে যান। ঘরে ঢুকে তিনি দেখেন, মহানবী (সা.) একটি খসখসে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন যার দাগ তাঁর পিঠে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল। তা দেখে হযরত উমর (রা.) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, রোমান ও পারস্য সম্রাটরা কত বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে, আর দোজাহানের বাদশা মহানবী (সা.) এমন অবস্থায় আছেন! মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, ‘তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা এই দুনিয়া লাভ করবে আর আমাদের জন্য রয়েছে পরকাল?’

মহানবী (সা.) তাঁর সন্তানদেরও সাদাসিধে জীবনযাপনের নির্দেশ দিতেন। একবার তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) তাঁর কাছে এসে যাঁতায় গম পেষার কষ্ট বর্ণনা করে একজন গৃহকর্মী চান। সেই সময়ে মহানবী (সা.) কিছু দাস বা সেবক পেয়েছিলেন। তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, ‘আমি কি তোমাকে এমন কিছু শেখাব না যা তোমার প্রার্থিত জিনিসের চেয়েও উত্তম? তা হলো, যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন ৩৪ বার “আল্লাহু আকবার”, ৩৩ বার “সুবহানাল্লাহ” এবং ৩৩ বার “আলহামদুলিল্লাহ” বলবে। এটি একটি দাস পাওয়ার চেয়েও উত্তম।’

মহানবী (সা.)-এর রীতি ছিল যে, তিনি ধন-সম্পদ বা দাস যাই পেতেন, তা নিজের বা পরিবারের জন্য রাখতেন না, বরং মানুষের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। মহানবী (সা.) বাড়িতে কী করতেন জানতে চাইলে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি ঘরের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতেন এবং নামাযের সময় হলে, নামায পড়তে চলে যেতেন।

হযরত (আই.) বলেন, অনেক নারী তাঁকে চিঠি লিখে জানান, তাঁদের স্বামীরা বাড়িতে অত্যন্ত কঠোর ও অন্যায় আচরণ করেন, অথচ মহানবী (সা.)-এর আদর্শ ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বামীদের এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত এবং মহানবী (সা.) যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা অনুসরণ করা উচিত।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, একদিন বাড়ি ফেরার পথে এক বৃদ্ধা নারী মহানবী (সা.)-এর পথ আগলে দাঁড়ান। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে তাঁর জীবনের কষ্টের কথা বলতে শুরু করেন এবং মহানবী

(সা.) পরম ধৈর্যের সাথে তা শোনেন। এছাড়া এও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) নবীদের সুন্নত অনুযায়ী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ছাগল চড়িয়েছেন। অতএব, একজন বাদশাহ্ হয়েও তিনি (সা.) অত্যন্ত সরল, অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে জীবনযাপন করেছেন। আল্লাহুস্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হাম্বীদুম মাজীদ।

পরিশেষে হযূর (আই.) পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ার নির্যাতিত ও নিপীড়িত আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আবেদন করেন এবং আহমদীদেরকে বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠ, ইস্তেগফার এবং তাহরীককৃত দোয়াগুলো অধিক হারে পাঠ করতে বলেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)